অরণ্যকাব্য

(গল্পগ্রন্থ – ক্ষণভঙ্গুর)

আমরা মাঠাবুরু বাংলোতে কয়েকদিন হল গিয়েছি। বাংলোর পেছনে দু'শ হাতের মধ্যে দীর্ঘ মাঠাবুরু শৈলমালা। বনে আচ্ছন্ন উপত্যকার সমতলে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে বনবিভাগের বাংলো। সেই ফাঁকা জায়গাটাতে বনবিভাগের লোকদের যত্নে কুলু-আপেল, নাশপতি, বোম্বাই আম, কাশীর পেয়ারা প্রভৃতির গাছ লাগানো হয়েছে—এখন চারাগাছ চেরা শালকাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা, অদূরবর্তী মাঠা গ্রামের গরু ছাগল প্রভৃতির উপদ্রব থেকে রক্ষা করবার জন্যে। গ্রামের লোকসংখ্যা পঞ্চাশ-ষাট ঘরের বেশি নয়, সবাই দরিদ্র, সবারই রাঙা মাটির দেওয়াল দেওয়া খোলার ঘর, কেবল একঘর গৃহস্থের বাড়ি পাথরের দেওয়াল। তারাই নাকি গ্রামের জমিদার, 'বাবু' খেতাবধারী। বাড়ির ছেলেদের উপাধি 'বাবু'। ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তার নাম দর্পনারায়ণবাবু, সে বনবিভাগের আরদালি, কুড়ি টাকা মাসিক বেতন। গবর্নমেন্টের দেওয়া কুড়ুল ঘাড়ে দর্পনারায়ণবাবু বনবিভাগের রেঞ্জারের পেছনে পেছনে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের লোকের উপজীবিকা বনজঙ্গল থেকে কাঠ চুরি করে বাঘমুণ্ডির হাটে বিক্রি করা; পাহাড়ের ওপর থেকে বেল, কেঁদ, পিয়াল, বুনো আলু, মিষ্টি ডুমুর, করঞ্জা প্রভৃতি বন্যফলসংগ্রহ করে আনা এবং বন্য জন্তু শিকার। আগে এ কাজে কোনো বাধা ছিল না, এখন বনবিভাগের কর্মচারীদের কড়াকড়িতে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আমরা বাংলোর সামনের মাঠে বেতের বড় বড় ইজিচেয়ারে শুয়ে গল্পগুজব করছিলাম। মি. মিশ্র ফরেস্ট অফিসার টুরে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে এসেছেন বাবু রতনলাল খাস্তগীর, পি.ডবলিউ.ডি-র ইঞ্জিনিয়ার, বিলেতফেরত ও কেতাদুরস্ত লোক। আর আছেন বাঘমুণ্ডি সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার মি. সরকার, ইনি নতুন চাকরি পেয়ে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছেন ন'মাইল দূরবর্তী বাঘমুণ্ডি নামক বনবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে। কয়েক মাস হল বর্মা থেকে অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন, জাপ-অভিযানের তোড়ের মুখে।

মি. সরকার চা খেতে খেতে বলছিলেন তাঁর বর্মা থেকে প্রত্যাগমনের রোমাঞ্চকর কাহিনী। পাঁচ টাকা সের চাল কিনে সঙ্গের ন'টি প্রাণী কোনোরকমে প্রাণধারণ করে এসেছিলেন এক এক থাবা ভাত খেয়ে। রাত্রে বন্যঅঞ্চলে বাঘের উপদ্রব তাঁবুতে। পথে কলেরায় একটি দুটি করে ছটি কাবার নটির মধ্যে।

ফাল্গুনের শেষ। বাংলোর পেছনে মাঠাবুরু পাহাড়ে করঞ্জা ফুল ফুটেছে—তার সুগন্ধ ঠিক জুঁই ফুলের মতো তীব্র। বাতাস মাতিয়েছে করঞ্জা ফুলের ঘন বাসে। রহস্যময় পর্বতারণ্যে বন্যকুক্কুটের ডাক এই খানিক আগেও শোনা যাচ্ছিল। আবার গভীর রাত্রে সেদিন শুনেছি অদ্ভুত কি এক জন্তুর আওয়াজ—কেউ বললে বাঘ, কেউ বললে সম্বর হরিণ।

মি. সরকার বললেন—এ জায়গাটা বড় চমৎকার সত্যি—বেশ অদ্ভুত ধরনের সিনারি।

আমি বললাম—স্বপ্নলোকে বাস করছি ক'দিন। আবার কলকাতা গিয়ে আপিস করতে হবে—সেই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি।

মি. মিশ্র বললেন—কাল আপনাকে মাঠাবুরু পাহাড়ের ওপরকার বনে নিয়ে যাব। কত রকম ফুল ফুটেছে দেখবেন এই সময়।

মি. সরকার বললেন—আমিও যাব।

আমি বললাম—আপনি কাল কাজে জয়েন করবেন না ?

—না। আমার জিনিসপত্তর এখনো বলরামপুর থেকে আসেনি।

—কিন্তু এর পরে আপনি বাঘমুণ্ডি যাওয়ার মোটর পাবেন না। মি. মিশ্র তো কাল চলেছেন ?

মি. মিশ্র বললেন—হ্যাঁ, কথাটা খানিকটা ঠিক। তবে আমি কাল কখন যাব বলতে পারি নে। দ্যাট ডিপেন্ডস্—পুরুলিয়া থেকে যদি তার আসে তবে।

—নয় তো ?

—নয়তো পরশু সকাল।

হঠাৎ মি. সরকার উৎকর্ণ হয়ে বললেন—ও কি ডাকছে বনে ?ভীষণ আওয়াজ !

—আমি হেসে বললাম—তাই তো ! কি বলুন তো ?

—আমি কিছুই বুঝছি না, কি ওটা ?

—মি. মিশ্র বললেন—প্রাগৈতিহাসিক ব্রন্টোসরাস নয়—নাথিং মোর দ্যান এ বার্কিং ডিয়ার।

মি. সরকার বিস্মিত হয়ে বললেন—বার্কিং ডিয়ার ! অমন শব্দ ! ও যে পাহাড় বন ফাটিয়ে দিচ্ছে আওয়াজে !

আমি হেসে বললাম—ও আপদ ওই রকম করে।

মি. মিশ্র চাকরকে ডেকে আরও কয়েক পেয়ালা গরম চা আনতে বললেন। বেশ লাগছিল এই চমৎকার রাত্রিটি, যদিও দিনে বেশ গরম, শুকনো শালপাতার গন্ধ মেশানো ও করঞ্জা পুষ্পের সুবাসে ভরা নৈশ বাতাস বাংলাদেশের অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রির মতো ঠাণ্ডা। আমরা কেউ কম্বল, কেউ আলোয়ান গায়ে দিয়ে বসেছিলাম।

আমি বললাম—বর্মা থেকে ফেরবার পথে পাহাড়-জঙ্গলের দৃশ্য কেমন দেখলেন মি. সরকার ?

—ওঃ, ছিন্দউইন নদী পার হয়ে মণিপুরের পথে যে অপূর্ব পাহাড়বনের দৃশ্য, তেমন দৃশ্য হঠাৎ চোখে পড়ে না। অনেক বড় বড় সাহেবের মুখেও আমি একথা শুনেছি। যারা অনেক বেড়িয়েছে, অনেক জায়গায় গিয়েছে, তারাও বলেছে। ভগবানের তৈরি দুনিয়ার একটা ভালো জিনিস যদি কেউ দেখতে চায়, তবে যে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক, যার বুকে সাহস ও উৎসাহ আছে, সে যেন মণিপুর বর্মা রোড ধরে ছিন্দউইন নদী পর্যন্ত যায়। চোখ সার্থক হবে। যদি পয়সা খরচ করে, পয়সাও সার্থক হবে।

ভৃত্য সবাইকে গরম চায়ের পেয়ালা দিয়ে গেল। আমাদের পরামর্শ হচ্ছিল আগামীকাল যদি পুরুলিয়া থেকে মি. মিশ্রের তার না আসে তবে বিকেলে মি. সরকারকে নিয়ে নাকটিটাঁড়ের ফরেস্টে সবাই মিলে টি-পিকনিকে যাওয়া যাবে।

মি. মিশ্র বললেন—বাঘমুণ্ডিতে বড্ড কষ্ট হবে আপনার মি. সরকার। ছোট্ট গ্রাম, একটি বাঙালি নেই। থাকবার ঘর পাবেন না। ডাকবাংলা আছে বটে কিন্তু তাতে কদিন থাকবেন ?রান্না করবে কে, নানা অসুবিধে। সভ্যতার মুখ দেখতে পাবেন না। পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে বাস।

মি. খাস্তগীর বললেন—থাকবার যতদিন ঘর জোগাড় না হয়, ততদিন উনি ডাকবাংলাতেই থাকবেন। সে ঠিক করে রেখেছি। ভদ্রলোকের ছেলে, যাবেন কোথায় ?গাছতলায় তো উঠতে পারেন না ?

মি. খাস্তগীর মি. সরকারের ওপরওয়ালা অফিসার। মি. সরকার কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে ওঁর দিকে চেয়ে বললেন—সে আপনার দয়া। যাতে ফ্যামিলি আনতে পারি, এ ব্যবস্থাটা করে দেবেন। নয়তো বড় কষ্ট হবে।

মি. মিশ্র বিস্ময়ের সুরে বললেন—ফ্যামিলি ?না মশায়, আমি আপনাকে সে পরামর্শ দিই নে।

—কেন ?

—না, এসব বেখাপ্পা জায়গায় কেউ ফ্যামিলি আনে ?

—আনছি আর কি সাধে ! নিতান্ত পেটের দায়ে !

—যাই হোক, আমার পরামর্শ অন্য রকম।

—এই, কৌন্ হ্যায় ?

দেখা গেল একটা বাইরের লোক রাস্তার ওপর থেকে চলে এসে বাংলার হাতায় ঢুকল। মি. মিশ্রের প্রশ্নের উত্তরে সে আরো কাছে এসে এক লম্বা সেলাম দিলে সবাইকে। তার পর এগিয়ে এসে মি. মিশ্রের হাতে একখানা চিঠি দিলে। মি. মিশ্র চিঠিখানা দেখে বললেন—এ তো বাংলা চিঠি দেখছি। আমি তো পড়তে পারব

না—এই নিন পড়ুন—কে লিখল চিঠি—আমার হাতেই চিঠিখানা দিলেন। আমি খুলে দেখলাম বাঁকা মেয়েলি হাতে লেখা কটি মাত্র ছত্রে লেখা চিঠি। তাতে লেখা আছে—"আমার স্বামী উপানন্দ মণ্ডল মৃত্যুশয্যায়। কয়দিন হইতে জ্বর আর ছাড়িল না। জ্ঞান নাই, একা আমি যে কি করিব, বুঝিতে পারি না। আমার হাতে টাকাপয়সা নাই। একজন লোক নাই যে আমার স্বামীকে বাঁচান। ইতি দুঃখিনী—উপানন্দ মণ্ডলের স্ত্রী।"

আমি উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই।

মি. খাস্তগীর বললেন—কি হল ?কোথাকার চিঠি ?ব্যাপার কি ?

আমি চিঠি পড়ে সকলকে শোনালাম। মি. মিশ্র জিজ্ঞেস করলেন—কোথাকার চিঠি ?কোন্ জায়গা থেকে আসছে ?

বাকি সকলেই হতবুদ্ধি।

হঠাৎ মনে পড়ল পত্রবাহক তো এখানে সশরীরে উপস্থিত। তাকে জিজ্ঞেস করা গেল কথাটা। সে বললে—বাঘমুণ্ডিসে।

আমি বললাম—এ বাবু কে ?

কনট্রাক্টরকা কিরানী।

—কোন্ কন্ট্রাক্টর ?

—ফরেস্ট ইজারদার। উ কন্ট্রাক্টর হুঁয়াপর নেহি রহতা হ্যায়। কিরানী বাবু উনকো কাম দেখতা থা। আজ সাত রোজসে বাবু বিমার পড়া—আউর—

মি. মিশ্র বললেন—বুঝতে পেরেছি, লোচনলাল কন্ট্রাক্টারের বুঝনদার। সবাই ঘাসের আঁটি ওজন করে, প্রেসে আঁটি বাঁধায়। সামান্য বিশ-ত্রিশ টাকা মাইনে পায়। ওখানে বাঙালি তো আর কেউ নেই।

মি. খাস্তগীর বলে উঠলেন—চলুন সবাই। একটি বাঙালি পরিবার বিপন্ন। এই বিদেশে-বিভুঁই এ। লেট আস—। মিনিট কুড়ির মধ্যে সকলে তৈরি হয়ে মি. মিশ্রের মোটরে এসে উঠলাম, সঙ্গে সেই পত্রবাহক। রাস্তার মাঝে মাঝে বনজঙ্গল বেশ ঘন স্থানে স্থানে—ডানদিকে দীর্ঘ মাঠাবুরু শৈলমালা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। বনে বনে করঞ্জা ফুলের সুবাস। উঁচুনীচু পথে শোভা নদী (কি চমৎকার নামটি) পার হয়ে (এখন জল নেই) রাত সাড়ে আটটার মধ্যে বাঘমুণ্ডি পৌঁছে গেলাম। পত্রবাহক নিয়ে গিয়ে তুলল এক খোলার বাড়িতে। বাড়ির সামনে একটা খুব বড় কুসুম গাছ। বাড়ির মধ্যে থেকে কান্নার শব্দ শুনে আমরা মোটর থেকে না পারি নামতে, না পারি হাত-পা কোলে করে বসে থাকতে। মি. মিশ্র হাঁক দিয়ে বললেন—কে আছেন বাড়িতে ?মোটরের হর্ন-ও বাজানো হল।

দু-তিনটে ওদেশী লোক কোথা থেকে জুটল এসে মোটরের কাছে।

মি. মিশ্র তাঁদের বললেন—এখানে এক বাঙালি বাবুর অসুখ ?

ওরা সাহেবী পোশাক পরা সব লোক দেখে থতোমতো খেয়ে গিয়েছিল। সেলাম দিয়ে সংক্ষেপে বললে—ও বাবু মর্ গিয়া।

আমরা সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম—সে কি ! কখন ?

—বেলা তিন বাজে।

—সৎকার হয়েছে ?

—নেহি বাবু।

—লাশ কোথায় ?

—বাড়িমে আভিতক্ হ্যায়। ক্যা করে বাবুজি, হামলোক তো মুসলমীন হ্যায়, বাঙালি হিন্দুকে লাশ কৌন্ লে যায়গা—

পত্রবাহকটির কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। সে বাড়ির ভেতর থেকে এসে আমাদের বললে—মাঈজী ডাকছেন আপনাদের।

বাড়ির মধ্যে গিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তা বড়ই করুণ। খোলার ছোট বাড়ির মধ্যে দু-তিনখানা আলোকবিহীন ঘর। একটা ঘরের দাওয়ায় দু-তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বসে কাঁদছে। ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে প্রথমটা ভালো দেখতে পাওয়া গেল না। তার পর দেখি দড়ির খাটিয়ায় কে যেন শুয়ে আছে, তার পাশে মেজের ওপর বসে একটি মেয়ে কাঁদছে। বিহারের পল্লীগ্রামের ঘর, ভালো আলোবাতাস আসবার ব্যবস্থা নেই এ সব ঘরগুলোতে। খোলার দোতলা করবে, অথচ উপযুক্ত পরিমাণে জানলা থাকবে না।

আমাদের দেখে মেয়েটি আরো চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

ওই অসহায় সদ্য-বিধবার কান্না যেন আর্তনাদের মতো শোনাল। তার মধ্যে স্বামীর জন্যে শোক কতকটা নিশ্চয়ই আছে, তার চেয়েও বেশি আছে নিজের কি উপায় হবে তার জন্যে আতঙ্কবোধ। আমরা যে ক'জন উপস্থিত আছি, সেটা খুব ভালো করেই বুঝলাম বাঙালি বিহারি সবাই।

মি. খাস্তগীর বললেন সান্ত্বনার সুরে—কাঁদবেন না মা। আমরা যখন এসেছি, তখন সব ব্যবস্থা হচ্ছে।

মি. মিশ্র ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে বললেন—ও, সো ভেরি স্যাড !

আমাদের আসতে দেখে দু-পাঁচটি লোক বাড়ির মধ্যে ঢুকল। এতক্ষণ কেউ ছিল না। মি. মিশ্র তাদের ধমক দিয়ে বললেন—বাঘমুণ্ডি গ্রামে কি এমন একজন মেয়েমানুষ নেই যে এই বিপদের সময় এখানে এসে দাঁড়িয়ে একটু সান্ত্বনা দেয় ?শুধু পয়সা করতেই এসেছে সব এখানে ?মনুষ্যত্ব শেখেনি ?

এখানে বেশির ভাগ লোক মুসলমান, আরা জেলা প্রভৃতি জায়গা থেকে এসেছে বন্যপালা কেনাবেচা করবার জন্যে। ছোট্ট গ্রাম, তবে বন্যপালার মস্ত বড় হাট বসে এখানে ফি সোমবারে। এ ব্যবসা উপলক্ষে অনেকগুলি বিদেশী লোক এখানে এসে বাস করছে, অনেকেই খোলার ঘরদোরও বানিয়েছে। নিজেরা থাকে, আবার ভাড়াও দেয়। হিন্দুও এদের মধ্যে অনেক।

সত্যই রাগ হয় বটে। এ লোকগুলো কি রে বাবা ! কেউ নেই ওর আত্মীয়স্বজন এখানে, সদ্য-বিধবা একটি মেয়ে স্বামীর মৃতদেহ আঁকড়ে পড়ে আছে বিদেশ-বিভুঁই-এ, এ অবস্থায় তাকে সান্ত্বনা দিতেও তো দু-চারটি স্থানীয় মেয়েছেলের আসা উচিত ছিল।

শুনলাম নাকি এসেছিল। একেবারে যে আসেনি তা নয়। কিন্তু এই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে বেলা তিনটের সময়, আর এখন রাত নটা। ছ ঘণ্টা ধরে কে বসে থাকবে এখানে, বাড়িঘরের কাজকর্ম সকলেরই আছে না কি ?

এ যুক্তি অকাট্য। কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। যদি দোষ দিতে হয় তবে মেয়েটির অদৃষ্টকে।

আমি বললাম—মা, কান্নাকাটি করে আর কি করবেন, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন সৎকার করবার ব্যবস্থা করতে হবে সকলের আগে। একটু বাইরে আসুন। আমরা জিজ্ঞেস করি—

মেয়েটি বাইরে এসে দাঁড়াল। কপাল কুটেছে, টিবি হয়ে ফুলে আছে কপালটা। বয়স তেইশ-চব্বিশ কি বড়জোর পঁচিশের মধ্যে। আধময়লা শাড়ি পরনে, রাত্রিজাগরণে এবং দুশ্চিন্তায় মুখ শীর্ণ, তবুও কেমন মনে হয় মেয়েটি এক সময়ে নিতান্ত খারাপ ছিল না দেখতে, রং ময়লা নয়, বরং ফর্সাই। হাতে দুগাছা সরু রুলি, গাছকতক কাচের চুড়ি।

ওর চোখে-মুখে গভীর নিরাশা আঁকা রয়েছে। অবলম্বনহীন নিঃসম্বল জীবনের আতঙ্ক ওর মুখের প্রতি রেখায়।

মি. খাস্তগীর ও আমার প্রশ্নের উত্তরে ওদের ঘটনা যা জানা যায় তা এই যে, ওর স্বামী উপানন্দ মণ্ডল এখানে ফরেস্ট কনট্রাক্টরের কেরানী। লোচনলাল কন্ট্রাক্টর বড়লোক, তার বহু জায়গায় ওরকম কত লোক মাইনে-করা আছে। সে নিজে থাকে ধানবাদে, এখান থেকে বহুদূর। তাও এক জায়গায় থাকে না। আজ আছে কলকাতায় তো কাল গেল খড়্গপুর।

উপানন্দ মণ্ডলের বাড়ি পুরুলিয়ার কাছে কি গ্রামে—কিন্তু মেয়েটির বাপেরবাড়ি নদীয়া জেলায়। আজ দশ বছর বিয়ে হয়েছিল—ওই তিনটি সন্তান তার ফল। বাপের বাড়ি অবস্থা খারাপ। শ্বশুরবাড়িতেও এক বৃদ্ধ জ্যেঠশ্বশুর ছাড়া আর কেউ নেই। চাকরি না করলে যদি সংসার চলবেই তবে এতদূরে পাণ্ডববর্জিত স্থানে পাহাড়-জঙ্গলের দেশে কেউ আসে চাকরি করতে !

বললাম—বাপের বাড়িতে কে আছে ?

—সৎমা ও দুটি বৈমাত্র ভাই।

—বাবা বেঁচে ?

—তাহলে কি আজ—বলেই মেয়েটি ডুকরে কেঁদে উঠল।

ওর এই কান্নার মধ্যে একটা অসহায় সুর ফুটে উঠল বেশি করে—সেটা ততটা আধ্যাত্মিক নয়, যতটা আধিভৌতিক। সংক্ষেপে সব বোঝা গেল। হাতে এমন পয়সা যার নেই যে কাল কি খাবে, তার আধ্যাত্মিক ক্রন্দনের সময় এটা নয়—তা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যত গভীর দাম্পত্য প্রেম থাকুক না কেন।

মি. খাস্তগীর আমাদের ইংরেজিতে বললেন—শেষকালে মৃতদেহ কি আমাদেরই বইতে হবে নাকি ?

বললাম—গতিক দেখে তাই মনে হচ্ছে।

—এখন—এত রাত্রে ?

—সকাল তিনটে থেকে সারারাত মড়া পড়ে থাকবে বাড়িতে ?সে হয় না।

আমাদের মোটর আসতে দেখে এবার অনেক লোক জড়ো হয়েছে বাড়ির উঠোনে ও বাড়ির সামনে।

তাদের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল পথে শোভা নদী পার হয়ে এসেছি ওরই ধারে শ্মশান। তবে বর্ণহিন্দু বলতে যা বোঝায় তা বাঘমুণ্ডি গ্রামে নেই—সুতরাং বর্ণহিন্দুর সৎকারপ্রথা এখানে যথাযথভাবে পালন করা হয় না, যেখানে যার খুশি সৎকার করে। এত রাত্রে সেই শোভা নদীর ধারে যেতে হবে ! সে এখান থেকে তিন মাইলের কম নয়।

মি. মিশ্র বললেন—লাশ আমার মোটরে তুলুন। আমার আপত্তি নেই। চলুন নদীর ধারে। এ প্রস্তাবে আমরা আপত্তি জানালাম। ওঁর আপত্তি না থাকতে পারে, কিন্তু হয়তো ওঁর স্ত্রীর আপত্তি থাকতে পারত। ওঁর এ উদারতার সুযোগ নেওয়া উচিত হবে না। ঝোঁকের মাথায় অনেকে অনেক কিছু বলে বইকি।

সেরাত্রে কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে উঠত না, কিন্তু ভুবনেশ্বর বাঁড়ুজ্যে বলে একটি মানভূমবাসী লোককে পাওয়া গেল হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে। তাকে স্থানীয় বন্য লোকের ভিড় থেকে চিনে নেওয়া অসম্ভব হত, যদি না ওদের মধ্যে কেউ বলে উঠত ওর দিকে আঙুল দিয়েদেখিয়ে—এ বেরাহ্মণ আছে—

—কে ব্রাহ্মণ আছে ?কই ?

একজন কালো ভূতের মতো লোক সলজ্জভাবে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার হয়ে এক পাশে দাঁড়াল। অতি ময়লা আটহাতি মোটা কাপড়, ধুলোমাটি লেগে রাঙা হয়ে গিয়েছে কাপড়খানা। রাস্তার কুলির কাজ করে কিনা কি জানি ! অতি গরিব ব্যক্তি।

তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সৎকার কোথায় হয় ?সে বললে, সেই নদীটার ধারে বালিএ—

অর্থাৎ শোভা নদীর ধারে বালির ওপর।

সে যেতে রাজী আছে। বিস্মিত হলাম যে সে কোনো পয়সার দাবি করলে না। সৎকারান্তে পরদিন তাকে কিছু বকশিশ দিতে গেলেও সে প্রথমটা নিতে চায়নি। এটাও বুঝেছিলাম তার এই প্রত্যাখ্যান মৌখিক নয়, আন্তরিক। শোভা নদীর ধারে সে-ই চিতা সাজিয়েছিল, ঘন ঘন কাঠ জুগিয়েছিল—অবিশ্যি আমরা মৃতদেহ নিজেরা বহন করলেও কাঠ মোটরে নিয়ে গিয়েছিলাম। তবে বড্ড বকে, এই মাত্র ওর দোষ। কিন্তু অক্লান্তকর্মী, কাজে ফাঁকি দিতে জানে না, সারারাত শোভা নদীর তীরবর্তী বনভূমি থেকে শুকনো শালের ডালাপালাও তাকে সেই রাত্রে সংগ্রহ করে আনতে হয়েছিল। কৃষ্ণা দ্বাদশীর ক্ষীণ চাঁদ যতটুকু ম্লান জ্যোৎস্না দান করলে শোভা নদীর বালির চরে, তাতেই শেষরাত্রে আমরা আমাদের কাজ সমাধা করে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটরে উঠে আবার বাঘমুণ্ডি ফিরে এলাম।

মেয়েটির ঘরদোর ওরই মধ্যে বেশ সাজানো।

বিদেশে গেরস্তালি পাতিয়েছিল বেশ একটু সাজিয়েই। মেয়েটির হাতের কারিকুরি—নিজের হাতে বোনা উলের কুকুর, 'পতি পরম গুরু' ইত্যাদি দেওয়ালে টাঙানো আছে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায়। সরস্বতী, মা কালীর ছবি। একখানা ক্যালেন্ডার, খানকতক টাঙানোধুতি একটা আলনায়। দুটো টিনের তোরঙ্গ একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসানো ঘরের একদিকে। অ্যালুমিনিয়মের ছোট ডেকচি একটা। সাজা পানের ডিবে ঝকমক করছে। কষ্ট হল ভেবে এ গৃহস্থালি ভেঙে যাবেআজই। যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল এ দুদিনের বাসা, তা আজ টলেছে। কত গৃহস্থালির এই একই দুঃখময় ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছি।

মেয়েটির নাম কি জানি নে। 'পতি পরম গুরু' বোনা ছবির তলায় লেখা আছে শৈলবালা দেবী, বোধ হয় ঐ নামই হবে ওর। শৈলবালা খুব কাঁদলে আমরা ফিরে এলে, এইবার আমাদের বকুনির ফলে জন-দুই স্ত্রীলোক দেখলাম ওর কাছে রাত্রে ছিল।

আমাদের পরামর্শ-সভা বসল। মি. মিত্র বললেন—এখন কি করা হবে বলুন ?

আমি গিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম—হাতে কি আছে আপনার ?

জানা গেল গোটা দুই টাকা ছাড়া কিছু নেই। অসুখের জন্যে সব খরচ হয়ে গিয়েছে। তার ওপর স্থানীয় মুদীর দোকানে আঠারো-উনিশ টাকা দেনা। দু মাসের বাড়িভাড়া বাকি, বাড়িওয়ালা হরদম তাগাদা দিচ্ছে।

আমি বললাম আপনার বাপেরবাড়িতে খবর দেব ?এখন কান্নার সময় না, ভেবে বলুন।

—সেখানে কোথায় যাব ?সৎমা ও দুই বৈমাত্র ভাই, তারা আমাকে স্থান দেবে না।

—শ্বশুরবাড়িতে খবর দিন তবে।

—এক বুড়ো জেঠশ্বশুর আছেন, তিনি একা থাকেন। রান্নাবান্না করেন, খান।

—কৃপণ ?

—তা নয়। গরিব। দুই ছেলে ও দুই নাতি মারা গিয়েছে। কেউ নেই।

—চলে কিসে ?

—কোনোরকমে চলে। সামান্য দুটো ধান হয় জমিতে। লোকের চিঠিপত্র আর দলিল লিখে কিছু পান, সেও আজকাল আর চোখে দেখেন না। তিনি কি জায়গা দেবেন ?তিনি তো আমার শ্বশুরের সঙ্গে এক সংসারে ছিলেন না। তিনি পৃথক হয়েছিলেন অনেকদিন আগে, আমার বিয়েরও আগে।

—আপনার স্বামীর বাড়িঘর নিশ্চয়ই আছে ?

—খোলার বাড়ি ছিল, মাটির দেয়াল। এতদিন আমরা বিদেশে, বাড়িঘরের অবস্থা কি রকম আছে কি জানি !

সব তথ্য সংগ্রহ করে এসে আবার পরামর্শ করতে বসি আমরা। এখানে রাখলে দেখাশুনো করবে কে ?তা ছাড়া জায়গা ভালো না। হাটবাজার করে এনে দেবে, এমন লোক নেই। উঁকি মেরে কেউ দেখবে না। অনেক ভেবে জেঠশ্বশুরকেই টেলিগ্রাম করা গেল।

আমি বললাম—তাতে ফল কি হবে ?তাঁর কি মাথাব্যথা পড়েছে, তিনি ছুটে আসবেন কোন্ দুঃখে ?

মি. খাস্তগীর বললেন—তবে কি সৎমাকে খবর দেবেন ?

—তাঁর দায় পড়েছে উত্তর দিতে।

—আপনি কি বলেন ?

—আমার মাথায় কিছু আসছে না।

—চলুন, এখান থেকে মেয়েটিকে আমরা ডাকবাংলোয় নিয়ে যাই। এখানে একদিনও রাখা চলবে না। জায়গা খারাপ।

বাড়িওয়ালাকে ডেকে জানা গেল কুড়ি টাকা বাড়িভাড়া বাকি, মুদীর দোকানেও টাকা কুড়ি—এই গেল চল্লিশ টাকা নগদ। তার পরে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর খরচ টাকা পনেরো—হাতে কিছু দেওয়া দরকার শ্রাদ্ধের খরচের জন্যে। একশ' টাকা।

মোটরে করে বিকেলে মেয়েটিকে ডাকবাংলাতে আনা গেল। জিনিসপত্র সামান্যই ছিল—গরুর গাড়িতে ডাকবাংলোয় পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দেওয়া গেল। ওদিকের ঘরটি ওদেরজন্যে ঠিক করে ওদের হবিষ্যের ব্যবস্থার জন্যে লোক পাঠানো গেল ভোজুডির বাজারে। গ্রাম থেকে একটি স্ত্রীলোক ঠিক করা গেল, শৈলবালার কাছে দিনরাত থাকবে।

দুদিন, তিনদিন কেটে গেল। কা কস্য পরিবেদনা ! না বাপের বাড়ি, না শ্বশুরবাড়ি—টেলিগ্রামের জবাব এল না কোথা থেকেও।

মি. খাস্তগীর বললেন—পুরুলিয়ায় হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারি ললিতবাবুকে একবার খবর দেওয়া যাবে ?এ যে বিষম দায়ে পড়া গেল !

মি. মিশ্র বললেন—আমাদের ডাকবাংলায় থাকবার মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছে তো। আমরাই বা ওঁকে নিয়ে এখন কি করি ?

আমি বললাম—অনাথ আশ্রম আছে না একটা ওখানে ?বা এই রকম কিছু ?

মি. খাস্তগীর বললেন—খ্রীস্টান মিশনারিদের। সে কথা বাদ দিন একেবারেই।

মহা ভাবনায় পড়া গেল। কারো মাথায় আসছে না কিছু। পরের মেয়ে নিয়ে এসে যে বিষম বিপদ দেখছি। শৈলবালা বেশ সেবাপরায়ণা, আমাদের জন্যে চা করে পাঠিয়ে দেয়, খাবার করে। ডাকবাংলার রান্নাঘরে গিয়ে নিজে রান্নার তদারক করে। আর সব সময়ে যেন কাঁদে। ওর ওপর নিষ্ঠুর হওয়া যায় না, একটা কিছু উপায় করতে হবে ওর। অথচ কি ভাবে, কেউ বুঝতে পারছি না।

আরো তিনদিন কেটে গেল। বিদেশে আমরা এমন কিছু বেশি টাকা নিয়ে বেরোইনি, এখন শৈলবালার কি করা যায় ?আমরা ডাকবাংলা থেকে চলে গেলে ওর উপায় কি হবে, কোথায় রেখে যাব ওকে, দিই বা কোথায় পাঠিয়ে ?এখানে বেশিদিন রাখাও যায় না, কে কি বলবে !

মাঝগ্রামের এক বৃদ্ধ বৈষ্ণবের পরামর্শে আমরা তার সঙ্গে শৈলবালাকে তার জেঠশ্বশুরের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

হাতে সামান্য কিছু টাকাও দিয়ে দিলাম ওর স্বামীর শ্রাদ্ধশান্তির জন্যে। এই ছ' সাত দিন ও ডাকবাংলার ঘরটাতে একটা ছোটখাটো সংসার পেতে বসেছিল—যাবার সময় বড় কান্নাকাটি করতে লাগল !

তার যেন যাবার ইচ্ছে নেই।

সে কি সত্যিই ভেবেছিল চিরকালের আশ্রয় হবে ওর এই ডাকবাংলায়—পথিপার্শ্বের ডাকবাংলায় ?যে আশ্রয় ওর স্বামীর ঘরে পেলে না ?

শৈলবালা ওর পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে মোটরে উঠছে, মোটরে ওকে বলরামপুর পাঠানো হবে, সেখান থেকে ট্রেনে উঠবে।

সন্ধ্যাবেলা, পঞ্চমীর জ্যোৎস্না পড়েছে মাঠাবুরু শৈলশ্রেণীর শালবনে, করঞ্জাফুলের তেমনি মিষ্ট সুবাস বাতাসে—সেদিন নাকটিটাঁড়ের বনে, শোভা নদীর তীরে বনভূমিতে যেমন পেয়েছিলাম। মাদল বাজছে মাঝগ্রামের মহুয়া মদের ভাঁটিতে। কেমন জীবনের মধ্যে ও যাচ্ছে, কে ওকে আশ্রয় দেবে—এ সব কথা মনে না উঠে পারল না। চলে গেল ওদের মোটর।

পরদিন সকালে মি. সরকার এসে হাজির।

আমরা বললাম—কি মনে করে ?হঠাৎ যে ?

—না, ওখানে আসব না। উপানন্দ মণ্ডলের ব্যাপারে বুঝলাম যে এখানে চাকরি পোষাবে না। ফ্যামিলি না নিয়ে থাকলে আমার চলবে না, আর আনলে তো অমন বিপদ সবারই হতে পারে। আজই রিজাইন দিয়ে দেব অমন জায়গার চাকরিতে।

মি. সরকার সেই দিনই পুরুলিয়ায় চলে গেলেন, তাকে বলে বুঝিয়ে কিছুতে রাখা গেল না।